মাওলানা আজাদের দৃষ্টিতে

পাকিস্তান

ভাষান্তর: শফিক আহমেদ

মাওলানা আজাদের দৃষ্টিতে পাকিস্তান

ভাষান্তর

শফিক আহমেদ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

প্রতিষ্ঠাতা : জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মাওলানা আজাদের দৃষ্টিতে পাকিস্তান
ভাষান্তর : শফিক আহমেদ
ইফা প্রকাশনা : ২৫৩৯
ইফা গ্রন্থাগার : ৯৫৪.৭
ISBN : 978-984-06-1313-7

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ২০১০
পৌষ ১৪১৭
মহররম ১৪৩২

মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক
আবু হেনা মোস্তফা কামাল
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
ফোন : ৮১২৮০৬৮

প্রচ্ছদ :
আহমাদ রফিক

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মোঃ হালিম হোসেন খান
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১১২২৭১

মূল্য : ২২.০০ টাকা

MOULANA AZADER DRISTEYTEY PAKISTAN (Pakistan in the eyes of Moulana Abul Kalam Azad) : Translated into Bangla by Shafiqe Ahmed. Published by Abu Hena Mustafa Kamal, Director Publication Depertment, Islamic Foundation Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka- 1207. Phone : 8128068 December. 2010

E-mail : islamicfoundation-bd@ yahoo. com
Website : www. islamicfoundation. org. bd

Price : Tk 22.00 ; US Dollar : 1.00

মহাপরিচালকের কথা

স্বাধীন ভারতের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী এবং ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি বিশ্ববরেণ্য আলিম মাওলানা আবুল কালাম আজাদ উপ-মহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব। মনীষা-দীপ্ত অসাধারণ একজন রাজনীতিবিদ। অনন্য চিন্তা-চেতনার প্রতীক। অসাধারণ গুণাবলী সম্পন্ন অত্যন্ত উঁচুমানের একজন মুহাক্কিক আলিম। একজন গবেষক ও লেখক। অনেক গ্রন্থের প্রণেতা। তিনি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্বে তদানীন্তন পাঞ্জাবের লাহোর থেকে প্রকাশিত 'চাতান' পত্রিকার সম্পাদকের সাথে তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর একটি সাক্ষাৎকার প্রদান করেন। উক্ত সাক্ষাৎকারটি সম্প্রতি 'দৈনিক কালের কণ্ঠ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সাক্ষাৎকারটির গুরুত্ব বর্তমান সময়েও হারিয়ে যায়নি। সাক্ষাৎকারটি পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হলে মাওলানা আবুল কালাম আজাদ সাহেবের অতুলনীয় দূরদর্শী বক্তব্য সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু পাঠক অবহিত হতে পারবেন। এ কথা বিবেচনায় রেখে দৈনিক কালের কণ্ঠ পত্রিকায় প্রকাশিত সাক্ষাৎকারটি পুস্তিকা আকারে প্রকাশের ব্যবস্থা নেয়া হলো।

সাক্ষাৎকারটি পাঠ করে পাঠক মাওলানা আবুল কালাম আজাদ সাহেবের চিন্তার স্বচ্ছতা ও বাস্তবতা, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, অগাধ পাণ্ডিত্য সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন বলে আমরা আশা করি।

সামীম মোহাম্মদ আফজাল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

ভূমিকা

আমাদের উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন মাওলানা আবুল কালাম আজাদ। ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস বিনির্মাণের পশ্চাতে তিনি এক মহানায়কের দায়িত্ব পালন করেন। প্রায় দুই দশক 'নিখিল ভারতীয় কংগ্রেসে'র সভাপতির পদে অত্যন্ত যোগ্যতা ও বিচক্ষণতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। তা সত্ত্বেও ভারত বিভক্তির অল্পকাল পূর্বে তিনি কংগ্রেসের সভাপতির দায়িত্ব ত্যাগ করে রাজনীতি থেকে নিজেকে অনেকটাই গুটিয়ে নেন। মাওলানা আজাদ ছিলেন একধারে যেমন বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ তেমনি ছিলেন একজন অসাধারণ মার্জিত রুচিসম্পন্ন বিজ্ঞ পণ্ডিত, লেখক ও চিন্তাবিদ।

মাওলানা আবুল কালাম আজাদ সম্পূর্ণ ইসলামী পরিবেশে গড়ে উঠেছিলেন। তাঁর পিতা মাওলানা মোহাম্মদ খয়ের উদ্দীনও ছিলেন একজন জ্ঞানী পণ্ডিত এবং আরবী-ফারসি ভাষায় বহু গ্রন্থ প্রণেতা। ভারতের প্রায় সর্ব এলাকায় তার হাজার হাজার শিষ্য ছিল। ১৮৫৭ সালে ব্রিটিশ বিরোধী বিক্ষোভ দমন করার পর তার পিতাও হাজার হাজার মানুষের মত জীবনের তাগিদে দিল্লী ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। এক সময় তাঁর বিশ্বস্ত শিষ্যদের সহযোগিতায় আরবে চলে যান এবং মক্কায় বসবাস করেন। সেখানে তিনি মক্কা নগরীর এক ধার্মিক বুযুর্গ ব্যক্তির কন্যার পাণি গ্রহণ করেন। এই মহিলার গর্ভে ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে মাওলানা আবুল কালাম আজাদের জন্ম হয়।

মাওলানা আজাদের মাতাও ছিলেন খুবই বুদ্ধিমতি এবং আরবী ভাষায় পণ্ডিত। তাঁর মাতা আরবী ছাড়া অন্য ভাষা না জানার কারণে আরবীই ছিল মাওলানা আজাদের মাতৃভাষা। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কোন বিদ্যালয়ে তাকে পাঠানো হয়নি। মা বাবা এবং বাবার বন্ধু আরবী ভাষাবিদ পণ্ডিতদের কাছে তিনি প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন। ১৮৯৮ সালে মাওলানা আজাদের পিতা তাঁর এক শিষ্যের জরুরী অনুরোধে ভারতে ফিরে আসেন এবং কলকাতায় বসবাস শুরু করেন। দশ বছর বয়সে মাওলানা আজাদ কলকাতায় গৃহ শিক্ষকের কাছে আরবী, ফারসি, দর্শন, যুক্তিবিদ্যা, অংক, ভূগোল ও ইতিহাস অধ্যয়ন করেন। সাধারণভাবে যে বিদ্যা অর্জনের জন্য চৌদ্দ বছর সময় লাগার কথা, অসাধারণ মেধাবী হওয়ার কারণে মাত্র চার বছরেরও কম সময়ে তিনি এই বিদ্যা অর্জন করেন। তিনি মাত্র বার বছর বয়সের সময়ে ইমাম গাজালির জীবনী লেখার

আগ্রহ প্রকাশ করেন। ষোল বছর বয়সে তিনি একজন খ্যাতিমান আলিম হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। অবসর সময় তিনি উর্দু ভাষায় অসামান্য শিল্প-সম্পন্ন কবিতা লিখতেন। চৌদ্দ বছর বয়সে তাঁর সম্পাদনায় 'লিসানুস সিদিক (সত্যের কণ্ঠ) নামে পত্রিকা প্রকাশিত হয় এবং তিনি সাংবাদিকতা শুরু করেন। ১৯১৪ সালে মাত্র ষোল বছর বয়সে তিনি আঞ্জুমানে হেদায়েতে ইসলাম কর্তৃক লাহোরে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে ভাষণদানের জন্য আমন্ত্রিত হন। তাঁর বক্তব্যের বিষয় ছিল 'ধর্মের যৌক্তিক ভিত্তি'। এই বক্তৃতা এমনই জ্ঞানগর্ভ ও যৌক্তিক ছিল যে, তাঁর অসাধারণ বাগ্মিতা ও পাণ্ডিত্যের সংবাদ সাড়া উপমহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। সেদিন তাঁর ভাষণদানের অনুষ্ঠানে শ্রোতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কবি হালী, কবি আল্লামা ইকবাল ও উর্দু গল্পকার নাজির আহমদ। তাঁর বক্তব্য শুনে কবি হালী তাকে 'যুবকের কাঁধে বৃদ্ধের মাথা' বলে আখ্যায়িত করেন।

১৯১২ সালে চৌদ্দ বছর বয়সে তিনি সাপ্তাহিক 'আল-হেলাল' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। তাঁর এই উর্দু পত্রিকাটি মুসলিম বিশ্বে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অসৎ উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনার মুখপাত্র হিসাবে আলোড়ন তোলে। পত্রিকাটির মাধ্যমে তাঁর বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন ও ইসলামী পুনর্জাগরণের চিন্তা-চেতনা দেশের মানুষকে দারুণভাবে উদ্দীপ্ত করে। ফলে বৃটিশ সরকার পত্রিকাটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এবং তাঁকে কারাগারে বন্দী করা হয়। এ সময় পত্রিকাটির প্রচার সংখ্যা পঁচিশ হাজারে পৌঁছেছিল।

ভারত বিভক্তির পর ১৯৪৭ সালে তিনি ভারতের শিক্ষামন্ত্রী হন এবং ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত আমৃত্যু তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

শুধু একজন প্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদ হিসাবেই নয়, ইসলামী চিন্তা-জগতেরও তিনি ছিলেন এক অসামান্য ব্যক্তিত্ব। ইতিহাস, ঐতিহ্য, ধর্মদর্শন, রাজনীতি, সমাজনীতি সকল বিষয়েই তিনি গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় রেখে গেছেন। সূরা ফাতিহার তাফসীর তাঁর একটি অনন্য কৃতিত্ব।

মাওলানা আজাদ প্রণীত গ্রন্থসমূহের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো : তাজকিরাহ, তাসাউরাতি কুরআন, তরজুমানুল কুরআন, বাকিয়াতে তরজুমানুল কুরআন, আল-হিদা, হযরত ইউসূফ, মীরকাতে আজাদ, শহীদে আজম, নফসে আজাদ, আসহাবে কাহাফ, আফসানাই হিজব বিসাল, কওলে ফয়সাল, সিরাতুল মুসতাকিম ইত্যাদি।

বক্ষ্যমাণ সাক্ষাৎকারটি ভারত বিভক্তির অব্যবহিত পূর্বে লাহোর থেকে প্রকাশিত প্রখ্যাত উর্দূ পত্রিকা 'চাতান'-এর সম্পাদক নিকট দেয়া। এই সাক্ষাৎকারে মাওলানা

আজাদের সমকালীন রাজনীতি এবং ভারত বিভক্তির প্রেক্ষাপট এবং ইসলাম রক্ষা নামে পাকিস্তান সৃষ্টির অবাস্তবতাকে যৌক্তিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান ভেঙ্গে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ সৃষ্টি মাওলানা আজাদের অসাধারণ প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার পরিচয়বাহী। জ্ঞান অনুসন্ধিৎসু পাঠকের সামনে পাকিস্তান সৃষ্টির অসারতা এবং বাংলাদেশ সৃষ্টির বাস্তবতা সম্পর্কে একজন বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ পণ্ডিতের বিশ্লেষণ কি তা জানার জন্য উক্ত সাক্ষাৎকারটি তুলে ধরা হলো।

সাক্ষাৎকারটি সম্প্রতি দৈনিক কালের কণ্ঠ পত্রিকায় বঙ্গানুবাদে প্রকাশ করা হয়। এটি বাংলায় ভাষান্তর করেছেন শফিক আহমেদ। সাক্ষাৎকারটির গুরুত্ব বর্তমান সময়েও হারিয়ে যায়নি। সাক্ষাৎকারটি পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হলে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের সুযোগ হবে। এ কথা বিবেচনায় রেখে দৈনিক কালের কণ্ঠ-এর সম্পাদক জনাব আবেদ খান-এর অনুমোদনক্রমে সাক্ষাৎকারটি পুস্তিকা আকারে প্রকাশের ব্যবস্থা নেয়া হলো।

আমরা আশা রাখি যে, পুস্তিকাটি বাংলাদেশের অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক রাজনীতির স্বপক্ষের শক্তির পক্ষে, দ্বি-জাতি তত্ত্বের অপরাজনীতির বিপক্ষে একটি শক্তিশালী দার্শনিক ভিত্তি তৈরীতে সহায়তা করবে।

র. আ. ম. উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী
গভর্নর, বোর্ড অব গভর্নরস
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
সম্পাদক, পাক্ষিক মত ও পথ

মাওলানা আজাদের দৃষ্টিতে পাকিস্তান

প্রশ্ন : হিন্দু-মুসলমানের এই বিভেদ ও ঝগড়া এখন এমন তুঙ্গে উঠেছে, তাতে কি মনে হয় না একটা সমঝোতায় পৌছানো একেবারে অসম্ভব! আপনি কি মনে করেন না, অবস্থা এখন এরকম যে, পাকিস্তানের জন্ম একেবারে অবশ্যম্ভাবী?

উত্তর : যদি পাকিস্তান সৃষ্টি হিন্দু-মুসলমানের সমস্যার সমাধান হতো তবে আমি তা নিশ্চয়ই সমর্থন করতাম। হিন্দুদেরও একটা অংশ এটা এখন সমর্থন করছে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও অর্ধেক পাঞ্জাব একদিকে, অন্যদিকে অর্ধেক বাংলা যদি চলে যায় তবুও যে বিরাট ভারতভূমি থাকবে তার ওপর আর সাম্প্রদায়িক দাবি-দাওয়া থাকবে না। আমরা যদি মুসলিম লীগের কথায় আসি, তাহলে তাদের ভাষায় এই নতুন ভারতবর্ষ হবে প্রকৃতপক্ষে একটি হিন্দু রাষ্ট্র। এটা অবশ্য কোনো স্থিরমনস্ক সিদ্ধান্ত নয়। এটা হবে একটি সামাজিক বাস্তবতার বিতর্কিত সিদ্ধান্ত। যে দেশে শতকরা ৯০ ভাগ লোক হিন্দু ও যারা আবহমানকাল থেকে নিজেদের নীতি ও আত্মিক বৈশিষ্ট্যে লালিত পালিত, তারা নতুন কোনো পরিবেশ স্বীকার করবে না। যেসব কারণ ভারতের মাটিতে ইসলামের ভিত্তিমূল স্থাপন করেছিল, তা এখন দেশভাগের এই রাজনীতিতে একেবারে অকেজো হয়ে পড়েছে। সাম্প্রদায়িক ঘৃণা এমন আকার ধারণ করেছে যে, ইসলাম ধর্ম প্রচার একেবারেই অসম্ভব। এই সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ধর্মকে এক বিরাট আঘাত করেছে। মুসলমানরা কুরআন থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে। মুসলমানরা যদি কুরআন ও হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জীবনী থেকে শিক্ষা নিত ও ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি তার সঙ্গে সংমিশ্রণ না করত, তবে ইসলাম প্রচারের গতি ব্যাহত হতো না। মোগল সাম্রাজ্যের শেষের দিকে মুসলমান জনসংখ্যা ছিল ২২ দশমিক ৫ মিলিয়ন বা সোয়া দুই কোটি, যা কিনা এখনকার সংখ্যার অনুপাতে প্রায় ৬৫ শতাংশ। তার পর থেকে মুসলমান জনসংখ্যা বেড়েই চলেছিল। যদি মুসলমান রাজনীতিবিদরা অভদ্র ভাষায় গালাগাল না করতেন (হিন্দুদের প্রতি) ও একশ্রেণীর মানুষ, যারা ব্রিটিশদের তাবেদার ছিল, তারা যদি এ দুই ধর্মের বিভেদকে আরো বড় করে না দিত তবে আজ ইসলামের শক্তি আরো বৃদ্ধি পেত।

ইসলামকে আমরা রাজনৈতিক বিভেদ ও ঝগড়ায় প্রাধান্য দিয়েছি অথচ ইসলামের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে নীতিবোধ জাগ্রত করে মানব আত্মার পরিবর্তন। ব্রিটিশ আমলে আমরা ইসলামকে এক নির্দিষ্ট পরিধিতে আবদ্ধ করে রেখেছিলাম ও অন্যান্য ধর্ম যথা—ইহুদি, পার্সি ও হিন্দুদের মতোই আচরণ করতাম। ভারতীয় মুসলমানরা ইসলামকে এক জায়গাতেই থামিয়ে রেখে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে গেল। কতকগুলো শাখা অবশ্য ব্রিটিশদেরই সৃষ্টি। ফলে এসব শাখার কোনো গতি বা ইসলামিক মূল্যবোধ রইল না। ইসলামের মূলমন্ত্র ক্রমাগত কঠোর সংগ্রামের মাধ্যমে নিজেদের সমুন্নত রাখা—এটা এখন তাদের কাছে এক অপরিচিত বিষয়। অবশ্যই তারা মুসলমান তবে নিজেদের খেয়াল-খুশিমতো। রাজনৈতিক শক্তির কাছেই ওরা মাথানত করেছে, ইসলামের মূল্যবোধের কাছে নয়। ওরা রাজনীতির ধর্মকে কুরআনের ধর্মের চেয়ে বেশি মূল্য দেয়। পাকিস্তান হচ্ছে একটা মতাদর্শ। এটা ভারতীয় মুসলমানদের সমস্যা উত্তরণের উপায় কিনা সেটা তর্কসাপেক্ষ, তবে পাকিস্তান দাবি করা হচ্ছে ইসলামের নামে। ইসলামে কোথাও লেখা নেই, ইসলাম বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের মধ্যে দেশ ভাগ করে ফেলতে হবে। কুরআন বা হাদীসে এ ধরনের নির্দেশ আছে কি ? এমন কোনো ইসলামী পণ্ডিত আছেন কি, যিনি স্রষ্টার এই বিরাট পৃথিবী উপরোক্ত কারণে ভাগ করার পরামর্শ দিয়েছেন ? এই মতাদর্শে আমরা যদি দেশ ভাগ করি তবে ইসলাম যে একটি সার্বজনীন ধর্ম তার ভিত্তি কোথায় রইল ? ভারতসহ অমুসলমান দেশে এই ক্রমবর্ধমান মুসলমান জনগোষ্ঠী সম্পর্কে আমরা কী ব্যাখ্যা দেব ?

ধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে দেশভাগ মুসলিম লীগের এক অদ্ভুত চিন্তা। ওরা এটাকে এক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত করতে পারে, তবে কুরআন বা ইসলামে এর কোনো বিধান বা নির্দেশ নেই। একজন ধার্মিক মুসলমানের আসল লক্ষ্য কী হওয়া উচিত ? ইসলামের আলোকে ছড়িয়ে দেওয়া, না নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে দেশ বিভক্ত করা ? এই পাকিস্তান দাবি মুসলমানদের কোনো উপকারেই আসবে না। পাকিস্তান সৃষ্টি হলে মুসলমানদের কী উপকার হবে—এ প্রশ্ন এখনো তর্কসাপেক্ষ; তবে এটা নির্ভর করবে কী ধরনের নেতৃত্ব দেশ শাসন করবে তার ওপর। পশ্চিমা চিন্তাধারা ও দর্শন এই সংকটকালকে আরো সংকটময় করে তুলবে। মুসলিম লীগ এখন যে পথে চলছে তাতে আমার স্থির বিশ্বাস যে,

একদিন পাকিস্তান ও ভারতীয় মুসলমানদের কাছে ইসলাম একটি দুষ্প্রাপ্য বস্তু হয়ে দাঁড়াবে। এটা সংক্ষেপে বললাম, তবে স্রষ্টাই জানেন ভবিষ্যতের গর্ভে কী নিহিত আছে। **পাকিস্তান যখনই সৃষ্টি হবে, তখন থেকে শুরু হবে ধর্মীয় সংঘাত। যতদূর আমি দেখতে পাচ্ছি, যাদের হাতে ক্ষমতার লাগামটা থাকবে, তারাই ইসলামের সমূহ ক্ষতি করবে। তাদের যথেচ্ছাচারের জন্য পাকিস্তানের যুব সম্প্রদায় ওদের থেকে একেবারে আলাদা হয়ে যেকোনো আন্দোলনে নেমে পড়তে পারে, যা মোটেই ধর্মভিত্তিক হবে না।** আজকাল দেখা যাচ্ছে, কোনো কোনো প্রদেশে যেখানে মুসলমানরা সংখ্যালঘু, সেখানকার মুসলিম যুবসম্প্রদায় তুলনামূলকভাবে মুসলিম সংখ্যাগুরু প্রদেশের যুব সম্প্রদায় থেকে অধিকতর ধর্মভাবাপন্ন। আপনি দেখবেন, আলেমদের বর্ধিত প্রভাবেও পাকিস্তান ধর্মের ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে ফেলবে।

প্রশ্ন : কিন্তু আলেমরা কায়েদে আজমের (এমএ জিন্নাহ) সঙ্গে ছিলেন।

উত্তর : সম্রাট আকবরের সঙ্গেও অনেক আলেম ছিল। ওরা একটা নতুন ধর্মও আবিষ্কার করল। ব্যক্তিগত কারো সম্পর্কে আলোচনা না-ই বা করলাম। আমাদের ইতিহাসে আলেমদের কর্মকাণ্ডের খতিয়ান ভরা। সর্বযুগে তারা ইসলামের অপমান ও মর্যাদাহানি করেছে। তবে তাদের মধ্যে দু-চারজন অবশ্য ব্যতিক্রম। এই এক হাজার বছরের মুসলমানের ইতিহাসে কতজন সম্মানিত ব্যক্তির নাম ওরা উচ্চারণ করেছে? ইমাম হাম্বল ও ইবনে তাইমিয়া সম্পর্কে কোনো উচ্চবাচ্য ওরা করেনি। ভারতবর্ষেও আমরা শাহ ওয়ালিউল্লাহ ও তাঁর পরিবার ছাড়া আর কারো কথা মনে করতে পারি না। উলামা সানির সৎসাহস সম্পর্কে আমরা অবগত এবং সেই উলামাকে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল রাজদরবারের সঙ্গে যুক্ত অন্য উলামাদের নালিশ ও উসকানির পরিপ্রেক্ষিতে। সে উলামারা এখন কোথায়? ওদের এখন কি কেউ সম্মান দেখায়?

প্রশ্ন : মাওলানা, বলুন তো যদি পাকিস্তান সৃষ্টি হয় তবে তাতে দোষের কী আছে? ইসলামকে তো ব্যবহার করা হচ্ছে সম্প্রদায়ের ঐক্য রক্ষার কাজে।

উত্তর : যে কাজের বা কারণের জন্য ইসলামকে ব্যবহার করা হচ্ছে তা ইসলামের মানদণ্ডে মোটেই সঠিক নয়। জামালের যুদ্ধে (হযরত আলী ও হযরত আয়েশার যুদ্ধ) তলোয়ারের আগায় কুরআন ঝুলিয়ে যুদ্ধ করা হয়েছিল। এটা কি ঠিক হয়েছিল? কারবালা যুদ্ধে যারা আমাদের নবীর পরিবারবর্গকে হত্যা করল,

সেসব মুসলমানও আমাদের নবীর সঙ্গী বা সাহাবা বলে দাবি করে। এটা কি উচিত বলে মনে হয় ? হাজ্জাজ নামে সেনানায়ক ছিলেন, তিনি তো মক্কার পবিত্র মসজিদ আক্রমণ করেছিলেন। এটা কি উচিত বলে গণ্য করা হবে ? কোনো পবিত্র বাণী অসৎ চিন্তা বা কর্মকে সঠিকভাবে নীতির আওতায় আনতে পারে না। যদি পাকিস্তন সৃষ্টি মুসলমানদের জন্য সঠিক হতো তবে আমি অবশ্যই তা সমর্থন করতাম। কিন্তু এই দাবির মধ্যে আমি অন্তর্নিহিত বিপদ দেখতে পাচ্ছি। আমি আশা করি না মানুষ আমাকে সমর্থন করবে, কিন্তু আমিও আমার বিবেকের বিরুদ্ধে যেতে পারি না। মানুষ সাধারণত জোরজবরদস্তি বা অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষার কাছে নতিস্বীকার করে। মুসলমানরা এখন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একটি কথাও শোনার পক্ষপাতী নয়, যতক্ষণ না পর্যন্ত এরা এটা হাতে পায় ও ভোগ করতে পারে। আজকের মুসলমানরা সাদাকে কালো বলতে রাজি আছে, কিন্তু পাকিস্তান দাবি ছাড়বে না। এই দাবি বন্ধ করার উপায় হচ্ছে—হয় ব্রিটিশ সরকারের তা মেনে না নেওয়া অথবা মি. জিন্নাহকে অন্য প্রস্তাবে রাজি করানো। (কংগ্রেস) ওয়ার্কিং কমিটির অন্য সহকর্মীদের কাজ থেকে জানলাম, ভারত বিভাগ মোটামুটি নিশ্চিত। কিন্তু আমি সাবধান করে দিচ্ছি, এই দেশভাগ অশুভ ও অমঙ্গল শুধু ভারতের জন্য নয়, পাকিস্তানও সমভাবে এর ভাগীদার হবে। বিভাগটা হচ্ছে ধর্মের জনসংখ্যার সংখ্যাগুরুত্বের ওপর ভিত্তি করে, কোনো প্রাকৃতিক সীমারেখা যথা–পাহাড়, মরুভূমি, নদী এদের ওপর ভিত্তি করে নয়। সীমারেখা একটা টানতেই হবে তবে ওটা কতদিন স্থায়ী হবে বলা কঠিন।

পাকিস্তান সৃষ্টির কল্পনা একটা ঘৃণা থেকে জন্ম নিয়েছে এবং যতদিন ঘৃণা বেঁচে থাকবে, ততদিনই এর অস্তিত্ব। এই ঘৃণা ভারত ও পাকিস্তানের সম্পর্ককে গ্রাস করে ফেলবে। এমন পরিস্থিতিতে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বন্ধুত্ব হওয়া বা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সম্ভব নয়, যদি না এ দুটি দেশ আকস্মিক কোনো বিপদের মধ্যে পড়ে। দেশভাগের এই রাজনীতি এ দুটি দেশের মধ্যে এক বিরাট প্রাচীর তৈরি করবে। পাকিস্তানের পক্ষে ভারতের সব মুসলমানকে সেখানে স্থান দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ তার ভূমিস্বল্পতা। পক্ষান্তরে হিন্দুদেরও পশ্চিম পাকিস্তানে বাস করা সম্ভব নয়। ওদের ওখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। এর প্রতিক্রিয়া ভারতেও দেখা যাবে এবং ভারতীয় মুসলমানদের জন্য তিনটি পথ খোলা থাকবে—

১) তারা তখন লুট ও নারকীয় অত্যাচারের শিকার হয়ে পাকিস্তানে চলে যাবে, কিন্তু পাকিস্তান কতজনকে জায়গা দিতে পারবে ?

২) তারা হত্যা বা অন্যান্য অত্যাচারের কবলে পড়বে। মুসলমানদের এক বিরাট অংশকে এই অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে, যতদিন না দেশভাগের এই তিক্ত স্মৃতি মুছে যায়।

৩) দারিদ্র্য, লুণ্ঠন ও রাজনৈতিক হতাশার শিকার হয়ে বহু মুসলমান ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করতে পারে।

মুসলিম লীগের বিশিষ্ট মুসলমানরা পাকিস্তানে চলে যাবে। ধনী মুসলমানরা পাকিস্তানের শিল্প-কলকারখানা ও ব্যবসা দখল করে পাকিস্তানের অর্থনীতিকে সম্পূর্ণ কব্জা করে ফেলবে। কিন্তু তিন কোটি মুসলমান ভারতে পড়ে থাকবে। তাদের জন্য পাকিস্তান কী রেখেছে ? হিন্দু ও শিখদের পাকিস্তান থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার পর ওদের অবস্থা আরো সাংঘাতিক আকার ধারণ করবে। পাকিস্তান তখন নিজেও বহু সমস্যায় জর্জরিত হবে। **সবচেয়ে বড় ভয়, বাইরের শক্তি পাকিস্তানকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইবে এবং কালক্রমে এই নিয়ন্ত্রণ কঠিন রজ্জু হয়ে পাকিস্তানকে বাঁধবে**। ভারতের অবশ্য এ সমস্যা নেই। তার ভয় শুধু পাকিস্তানের শত্রুতা। **আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মি. জিন্নাহর দৃষ্টি এড়িয়ে** গেছে। সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ। তিনি জানেন না, বাংলাদেশ বাইরের কোনো নেতৃত্ব মেনে নেয় না। আজ কিংবা কাল তারা সে নেতৃত্ব অস্বীকার করবে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ফজলুল হক জিন্নাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। তাঁকে মুসলিম লীগ থেকে বহিষ্কার করা হলো। সোহরাওয়ার্দীও যে জিন্নাহকে খুব সম্মানের চোখে দেখতেন, সেটাও বলা যায় না। মুসলিম লীগ কেন, কংগ্রেসের ইতিহাসই দেখা যাক। সুভাষ চন্দ্র বসুর বিদ্রোহের কথা সবাই জানেন। গান্ধিজি সুভাষ বসুর কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হওয়ায় অত্যন্ত নাখোশ ছিলেন ও তাঁকে সরানোর জন্য রাজকোটে আমরণ অনশন শুরু করলেন। সুভাষ বসু গান্ধিজির বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন এবং নিজেকে কংগ্রেস থেকে সরিয়ে নিলেন। বাংলাদেশের পরিবেশ এমনই যে বাঙালিরা বাইরের নেতৃত্ব অপছন্দ করে এবং তখনই বিদ্রোহ করে, যখন দেখে যে তাদের অধিকার বা সুযোগ-সুবিধা বিশেষভাবে ক্ষুণ্ন হওয়ার আশঙ্কা আছে।

যতদিন জিন্নাহ ও লিয়াকত আলী জীবিত আছেন তত দিন পর্যন্ত পাকিস্তানের প্রতি তাদের বিশ্বাস থাকবে। কিন্তু ওঁরা যখন থাকবেন না তখন যেকোনো ছোট ছোট ঘটনায় ওদের মধ্যে অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠবে। আমি মনে করি, পূর্ব পাকিস্তানের পক্ষে পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে বহু দিন এক সঙ্গে থাকা মোটেই সম্ভব নয়। এই দুই ভূখণ্ডে ধর্ম ছাড়া আর কোনো বাঁধন নেই। আমরা মুসলমান—এই মর্মে কোথাও স্থায়ী রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে ওঠেনি। আরব দেশগুলো আমাদের সামনে এক ধর্ম, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ভাষা সবই এক। কিন্তু তাদের সরকার ভিন্ন ভিন্নভাবে গঠিত এবং প্রায়ই এরা ঝগড়া-কলহ ও শত্রুতার মধ্যেই আছে। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা, নিয়ম-কানুন, আচার-ব্যবহার ও জীবনপ্রবাহ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে একেবারে আলাদা। পাকিস্তান সৃষ্টির প্রাক্কালে এখন ওদের মনে যে উষ্ণতা আছে, তা পরে ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যাবে এবং বিরোধ ও প্রতিবাদ দানা বেঁধে উঠবে। তখন বাইরের শক্তিগুলো এতে ইন্ধন জোগাবে ও একসঙ্গে এই দুই খণ্ড আলাদা হয়ে যাবে। পূর্ব পাকিস্তান আলাদা হয়ে যাওয়ার পর যাই ঘটুক না কেন, অন্য প্রদেশগুলো পারস্পরিক বিরোধ ও ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে পুরো পশ্চিম পাকিস্তানকে রণক্ষেত্রে পরিণত করবে। পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নিজেদের আলাদা আলাদা জাতি বলে ঘোষণা করবে। এই যখন অবস্থা হবে, তখন পুরো ব্যাপারটা বাইরের শক্তির নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে। তখন পাকিস্তান বলকান বা আরব রাজ্যের মতো খণ্ড খণ্ড হয়ে যাবে। এ সময় হয়তো আমরা নিজেদের প্রশ্ন করব—কী পেলাম আর কী হারিয়েছি।

আসল বিষয় হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নতি, ধর্ম নয়। মুসলমান ব্যবসায়ীদের মধ্যে সক্ষমতা ও প্রতিযোগিতার মনোভাব সম্বন্ধে আমি যথেষ্ট সন্দিহান। পৃষ্ঠপোষকতা ও বিশেষ সরকারি সুবিধায়ই ওরা অভ্যস্ত। এখন ভারতের এই নতুন স্বাধীনতা প্রাপ্তিকে তারা ভয়ের দৃষ্টিতে দেখছে। নিজেদের ভয়টাকে ঢেকে রাখার জন্য তারা দ্বিজাতিতত্ত্বের ব্যাপারে সোচ্চার এবং একটা মুসলিম রাষ্ট্র চায়, যেখানে তারা সম্পূর্ণ অর্থনীতিটাকে কব্জা করতে পারে ও সেখানে অন্যান্য প্রতিযোগীর প্রবেশ নিষিদ্ধ। দেখা যাক, কত দিন এই বঞ্চনাকে ওরা বাঁচিয়ে রাখতে পারে। আমি মনে করি, দেশ ভাগ হওয়ার পর পাকিস্তান কী কী সমস্যায় জর্জরিত হবে—

১) অযোগ্য রাজনৈতিক নেতৃত্ব সামরিক শাসন ডেকে আনবে, যা নাকি অনেক মুসলমান রাষ্ট্রে ঘটেছে।

২) প্রচুর বৈদেশিক ঋণের বোঝা।

৩) প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক না থাকায় সংঘর্ষ অনিবার্য।

৪) অভ্যন্তরীণ অসন্তোষ এবং বিভিন্ন এলাকা বা প্রদেশের মধ্যে অন্তর্বিরোধ।

৫) নতুন ধনী এবং শিল্পপতিদের দ্বারা জাতীয় সম্পত্তি লুট ও আত্মসাৎ।

৬) অসন্তোষের উৎপত্তি, ধর্ম থেকে যুব সম্প্রদায়ের বিচ্যুতি এবং পাকিস্তান মূলমন্ত্রে ধস নামা।

৭) নব্য ধনীদের শোষণ থেকে একটা শ্রেণী সংগ্রামের আশঙ্কা।

৮) পাকিস্তানকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র।

এ অবস্থায় পাকিস্তানের স্থায়িত্ব খুবই একটা চাপের মুখে পড়বে ও কোনো মুসলিম রাষ্ট্র থেকে কার্যকরী সাহায্য পাওয়া যাবে না। অন্য রাষ্ট্রগুলোর কাছ থেকে শর্তসাপেক্ষ সাহায্য পাওয়া যেতে পারে, তবে পাকিস্তানের মূলমন্ত্র ও রাষ্ট্রকে এর জন্য প্রচুর মূল্য দিতে হবে।

প্রশ্ন : প্রশ্ন হচ্ছে, মুসলমানরা এখন কেমন করে নিজেদের পরিচয় ও স্বকীয়তা বজায় রাখবে এবং কেমন করে মুসলিম রাষ্ট্রে নাগরিকদের উপরোক্ত গুণগুলো বিস্তারলাভ করবে ?

উত্তর : ফাঁকা বুলি দিয়ে মূল বাস্তবতাকে অস্বীকার করা যায় না—এটা শুধু যেকোনো আলোচনাকে বিকৃত পর্যায়ে আনতে পারে। মুসলমান সম্প্রদায়ের পরিচয় বা স্বকীয়তা বলতে আমরা কী বুঝি ? ব্রিটিশ দাসত্বেও যদি আমরা আমাদের স্বকীয়তা না হারিয়ে থাকি, তবে স্বাধীন ভারতে তা হারাব কেন—যেখানে রাষ্ট্রের সব ক্ষেত্রে সমানভাবে কাজ করার সুযোগ রয়েছে। মুসলিম রাষ্ট্রের বিশেষ গুণাবলি কি বলতে পারেন ? আসল বিতর্কের বিষয় ধর্মরক্ষা ও উপাসনার পূর্ণ স্বাধীনতা। এর বাধা কোথায় ? এই স্বাধীনতা কি ৯০ মিলিয়ন মুসলমানকে ধর্মীয় স্বাধীনতার ব্যাপারে একেবারে অসহায় করে দেবে ? বিশ্বের এক বিরাট শক্তি হচ্ছে ব্রিটিশ, তারাই যখন তা পারেনি তাহলে হিন্দুদের এমন কি শক্তি আছে, যাতে ওরা এই ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে পারবে ? এই প্রশ্ন তারাই

তুলেছে যারা পশ্চিমা কায়দায় শিক্ষিত, নিজেদের ঐতিহ্য সম্বন্ধে বিস্মৃত ও রাজনৈতিক ফাঁকা বুলিতে অভ্যস্ত। ভারতের ইতিহাসে মুসলমানদের ইতিহাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনি কি মনে করেন মুসলমান রাজারা ইসলামের সেবা করত ? ইসলামের সঙ্গে ওদের নামমাত্র সম্পর্ক ছিল। তাঁরা ইসলাম প্রচারক ছিলেন না। ভারতের মুসলমানরা সূফী-ফকিরদের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞতাবদ্ধ। অথচ এই সূফীদের অনেককে রাজাদের নিষ্ঠুর নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছিল। অধিকাংশ মুসলমান রাজা নিজেরাই নিজেদের উলামা সংসদ তৈরি করে নিয়েছিলেন, আর তাঁরাই ছিলেন ইসলামের মূল্যবোধ ও আত্মিক বৈশিষ্ট্য প্রচারে সবচেয়ে বড় বাধা।

তবুও সংস্কৃতি, সংগীত, শিল্প, স্থাপত্য এবং ভাষার ওপর মুসলমান শাসনকালের এক বিরাট ছাপ ও স্বাক্ষর রয়ে গেছে। ভারতের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র যথা দিল্লি, লক্ষ্ণৌ কী বার্তা বহন করছে ? সেখানে অন্তর্নিহিত মুসলিম বৈশিষ্ট্যই প্রকাশ পাচ্ছে।

যদি মুসলমানরা মনে এই শঙ্কা পোষণ করে এবং বিশ্বাস করে, স্বাধীন ভারতে তাদের দাসত্ব করতে হবে, তবে আমি তাদের ধর্ম ও হৃদয়ের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় দেখছি না। যে মানুষ জীবন সম্পর্কে বীতরাগ বা অনাসক্ত তাকে সাহায্যের মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা যায়; কিন্তু যে সাহসহীন, ভীতু তাকে সাহসী ও শক্তিমান করা সম্ভব নয়। সম্প্রদায় হিসেবে মুসলমানরা এখন কাপুরুষ। তাদের স্রষ্টাভীতি নেই—আছে মানুষকে ভয় করা। এতেই বোঝা যাবে, কেন মুসলমানরা তাদের অস্তিত্বে সন্দিহান। একেবারে মিথ্যা কল্পনার শিকার।

ব্রিটিশরা যখন দেশ দখল করল তখন তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ভীষণ ব্যবস্থা নিল; কিন্তু তাতে মুসলমান সম্প্রদায় ধ্বংস হয়ে যায়নি। পক্ষান্তরে যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার কথা, তার থেকে বেশিই বৃদ্ধি পেল। মুসলমান সংস্কৃতির আত্মিক বৈশিষ্ট্য ও মূল্যবোধের একটা নিজস্ব মাধুর্য আছে। তা ছাড়া ভারতের তিন দিকে মুসলিম রাজ্য। তাহলে কেন সংখ্যাগুরুরা ভারতের ৯০ মিলিয়ন মুসলমানকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে ? এতে তাদের কী লাভ হবে ? ৯০ মিলিয়ন নিশ্চিহ্ন করা কি এতই সহজ ?

বস্তুত আমার মনে হয়, মুসলিম সংস্কৃতির আবেদনের প্রভাবে এমন একদিন আসতে পারে, যখন ইসলাম ধর্মের অনুসারীরাই হবে স্বাধীন ভারতের সর্ববৃহৎ সম্প্রদায়।

পৃথিবীর জন্য প্রয়োজন স্থায়ী শান্তি ও দার্শনিক চিন্তাধারা। হিন্দুরা যদি কার্ল মার্কসের অনুসারী হতে পারে, পশ্চিমের দর্শন ও জ্ঞান অনুশীলন করতে পারে এবং এ ক্ষেত্রে যদি ইসলামের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন না করে, তবে এর নীতি থেকে অনেক উপকার পেতে পারে। বস্তুত ওরা বিশ্বাস করে, কোনো সংকীর্ণতা বা অনুদারতা ইসলামের মধ্যে নেই এবং স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থায়ও বিশ্বাসী নয়। ইসলাম হচ্ছে শান্তি ও প্রত্যেকের জন্য সমান অধিকার—এই মন্ত্রের এক বিশ্বব্যাপী আহবান। ওরা জানে ইসলাম হচ্ছে এক প্রেরিত পুরুষের ঘোষণা, যার মাধ্যমে কেবল স্রষ্টার উপাসনার কথাই বলা হয়েছে। ইসলাম হচ্ছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভেদাভেদ থেকে মুক্তি এবং সমাজকে পুনর্গঠনসহ তিনটি মূলনীতির উপর দাঁড়ানো। যথা—স্রষ্টায় বিশ্বাস, ন্যায়বিচার ও জ্ঞান।

আমাদের এই চরমপন্থী মনোভাব ও ব্যবহার অমুসলমানদের ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। যদি আমরা আমাদের স্বার্থপর উদ্দেশ্য দিয়ে ইসলামকে অপবিত্র না করতাম, তাহলে অনেক সত্যান্বেষী ইসলামের মধ্যে সান্ত্বনা পেত। পাকিস্তানের সঙ্গে ইসলামের কোনো যোগ নেই। এটা মুসলিম লীগের একটা রাজনৈতিক দাবি, যা দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে, ভারতীয় মুসলমানদের এটাই হবে জাতীয় লক্ষ্য। আমার মনে হয়, যে সমস্যায় মুসলমানরা ভুগছে এটা তার কোনো সমাধান নয়। এটা আরো সমস্যা ডেকে আনবে।

আমাদের নবী বলেছেন, স্রষ্টা আমার জন্য গোটা পৃথিবীকে একটা মসজিদে রূপান্তরিত করেছেন। এখন আমাকে মসজিদ ভাগ করতে বলো না কিন্তু; যদি এই ৯ কোটি মুসলমান সারা ভারতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে এবং দু-একটা প্রদেশে ওরা সংখ্যাগুরু হয় এবং সেই প্রদেশগুলোর পুনর্গঠন চায়, তবে তার মধ্যে কিছু যৌক্তিকতা থাকতে পারে। কিন্তু এ ধরনের দাবি ইসলামের দৃষ্টিতে সঠিক নয়। তবে শাসনব্যবস্থার কারণে তা মেনে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু বর্তমান অবস্থা একেবারে বিপরীত। যতগুলো প্রদেশ ভারতের শেষ সীমানায় আছে, তার প্রায় সবই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং ওদের সীমানা অন্য মুসলিম রাষ্ট্রের সঙ্গে সংযুক্ত। এখন এই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীকে কি কেউ উৎখাত করতে পারে?

পাকিস্তান দাবির মাধ্যমে আমরা এক হাজার বছরের ইতিহাস থেকে মুখ ফিরিয়ে আছি এবং মুসলিম লীগের পরিভাষা ব্যবহার করে বলতে পারি—৩০ মিলিয়ন মুসলমানকে হিন্দুরাজের কবলে থাকতে হবে। হিন্দু-মুসলমান সমস্যা, যা নাকি কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে অস্থিরতার সৃষ্টি করেছে, সেটা এক সময় দুই রাষ্ট্রের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি করবে ও বহির্রাষ্ট্রের ইন্ধন জোগানোর ফলে এটা বিরাট যুদ্ধের আকার নেবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, পাকিস্তান সৃষ্টির মধ্যে যদি এত ভয় ও আশঙ্কা নিহিত থাকে, তবে হিন্দুরা এটার বিরোধিতা করছে কেন ? আমার মনে হয় এই বিরোধিতা ওদের মধ্যে দুই মতাদর্শীর কাছ থেকে আসছে। একদল মনে করে, পাকিস্তান একটি সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের ঘাঁটি হবে। একটি স্বাধীন ও অখণ্ড ভারত হলে সে নিজেকে সব চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে।

আরেক দল যারা পাকিস্তান দাবির বিরোধিতা করছে তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলমানদের উসকে দেওয়া, যাতে তারা তাদের পাকিস্তান দাবি সম্পর্কে আরো কঠিন অবস্থান নিতে পারে আর এভাবে ওরা মুসলমানমুক্ত একটা দেশ লাভ করবে। সংবিধান অনুযায়ী মুসলমানদের নিরাপত্তা পাওয়ার পূর্ণ অধিকার আছে। কিন্তু দেশভাগ হলে তাতে কোনো ফল লাভ হবে না। পাকিস্তান দাবি এই সাম্প্রদায়িক সমস্যার এক ভ্রান্ত সমাধান।

ভবিষ্যতে ভারত সাম্প্রদায়িক সমস্যার সম্মুখীন হবে না, তবে শ্রেণী সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে। মূলধন ও শ্রম বা মালিক-শ্রমিকের সংঘর্ষ চলবে। কমিউনিস্ট ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন বাড়ছে আর এটাকে মোটেই অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখা উচিত হবে না। এই আন্দোলন নির্যাতিত বা শোষিত জনগণের জন্য সংগ্রাম করে যাবে। মুসলমান পুঁজিবাদী ও জমিদার শ্রেণীর মনে এই আশঙ্কা বলবৎ। এখন এরা সম্পূর্ণ ব্যাপারটায় একটা সাম্প্রদায়িক রং দিয়ে অর্থনৈতিক সমস্যাটাকে একটা সাম্প্রদায়িক বিবাদে পরিণত করেছে। কিন্তু মুসলমানরা একা এটার জন্য দায়ী নয়। এই কৌশল প্রথমে ব্রিটিশরা তৈরি করে ও পরে আলীগড়ের রাজনীতিমনস্ক ব্যক্তিরা এটা গ্রহণ করে। পরে হিন্দুদের অদূরদর্শিতায় বিষয়টা আরো ঘোলাটে হয়ে যায়। এখন মনে হচ্ছে দেশভাগ ছাড়া স্বাধীনতা পাওয়া যাবে না।

জিন্নাহ এককালে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রতীক ছিলেন। কংগ্রেসের এক অধিবেশনে সরোজিনী নাইডু তাঁকে এই উপাধি দিয়েছিলেন। তিনি দাদাভাই

নৌরাজির শিষ্য ছিলেন। উনি ১৯০৬ সালে মুসলমানদের এক 'ডেপুটেশন"-এ অংশগ্রহণ করতে রাজি হননি। সেই সময় থেকেই ভারতে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বীজ বপন শুরু হলো। ১৯১৯ সালে তিনি জাতীয়তাবাদী হিসেবে জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটিতে মুসলমানদের আলাদা দাবি উত্থাপনের প্রবল বিরোধিতা করেছিলেন। ১৯২৫ সালের ৩ অক্টোবর 'টাইমস অব ইন্ডিয়া' পত্রিকায় একটা চিঠি লিখেছিলেন, যাতে তিনি 'কংগ্রেস একটি হিন্দু সংগঠন' এই যুক্তি একেবারে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। ১৯২৫ ও ১৯২৮ সালে সর্বদলীয় অধিবেশনে তিনি যুক্তভোটের সপক্ষে তাঁর অভিমত রেখেছিলেন। ১৯২৫ সালে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে বলেছিলেন, 'প্রথমত ও শেষ পর্যন্ত আমি একজন জাতীয়তাবাদী' এবং হিন্দু ও মুসলমান সহকর্মীদের বললেন, তারা যেন সাম্প্রদায়িক বিষয়গুলোকে পরিহার করে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিকে এক সত্যিকারের জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে।

১৯২৮ সালে যে সাইমন কমিশন ভারতে এসেছিল তা 'বয়কট' করার ডাক জিন্নাহ দিয়েছিলেন। ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত তিনি দেশভাগের সপক্ষে ছিলেন না। তিনি বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনকে বলেছিলেন, তারা যেন হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের ওপর কাজ করে যায়। কিন্তু তখনই ক্ষুব্ধ হলেন, যখন কংগ্রেস মুসলিম লীগকে বাদ দিয়ে সাতটি প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠন করল। ১৯৪০ সালে মুসলমানদের রাজনৈতিক অবক্ষয় ঠেকাতে তিনি দেশভাগ সমর্থন করলেন। আমার সম্পর্কে মতামত দেওয়ার সম্পূর্ণ অধিকার মি. জিন্নাহর আছে। তাঁর বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে আমার কোনোই সন্দেহ নেই। রাজনীতিবিদ হিসেবে তিনি মুসলমান সাম্প্রদায়িকতা ও পাকিস্তান দাবির জন্য প্রচুর পরিশ্রম করেছেন। এখন তিনি এই দাবি ছাড়তে পারেন না, কারণ এতে তাঁর সম্মানের লাঘব হবে।

প্রশ্ন : এখন এটা পরিষ্কার যে, মুসলমানরা পাকিস্তান দাবি ছাড়বে না। যুক্তি, তর্ক, বিচারবোধ এদের মাথায় কেন ঢুকছে না ?

উত্তর : কোনো নীতিবিচ্যুত জনতার উদ্দামতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বড় কঠিন কাজ। কিন্তু কারোর বিবেককে দাবিয়ে রাখা মৃত্যুর চেয়েও খারাপ। মুসলমানরা আজকাল আর হাঁটে না। ওরা আবেগতাড়িত হয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে। সমস্যা হচ্ছে, মুসলমানরা স্থিরভাবে কখনো হাঁটতে শেখেনি। হয় তারা দৌড়াবে কিংবা স্রোতের টানে ভেসে যাবে। একশ্রেণীর মানুষ যখন আত্মবিশ্বাস ও আত্মসম্মান হারিয়ে ফেলে তখন তাদের ঘিরে রাখে কাল্পনিক সন্দেহ ও ভয়। তখন তারা কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল বিচার করতে অক্ষম। সংখ্যার শক্তি দিয়ে জীবনের মূল্যকে

অনুভব করা যায় না। কেবলমাত্র দৃঢ় বিশ্বাস ও কল্যাণমুখী কাজেই তা লব্ধ হবে। এই ব্রিটিশ রাজনীতি মুসলমানদের মনে প্রচুর আশঙ্কা ও অবিশ্বাসের জন্ম দিয়েছে। এখন তারা এতই ভীত ও সন্ত্রস্ত যে, তারা চায় ব্রিটিশরা ভারত ছাড়ার আগেই যেন দেশভাগ হয়ে যায়। ওরা কি মনে করে দেশভাগ হলেই সব আশঙ্কা থেকে মুক্ত হওয়া যাবে ? এই শঙ্কা যদি সত্যিই থাকে, তবে এগুলো তাদের সীমান্তে গিয়ে আঘাত হানবে এবং তা থেকে বেশ বড় রকম একটা যুদ্ধ বাধবে। জীবন ও ধনসম্পত্তির যে বিরাট ক্ষতি হবে তা হবে চিন্তার বাইরে।

প্রশ্ন : হিন্দু ও মুসলমান দুটো ভিন্ন জাতি। তাদের মধ্যে সাদৃশ্যও নেই। এদের মধ্যে ঐকমত্য কেমন করে সৃষ্টি হবে ?

উত্তর : এই বিতর্ক বহু আগেই বাতিল হয়ে গিয়েছে। আল্লামা ইকবাল ও মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানীর মধ্যে এ বিষয়ে চিঠিপত্র লেখালেখি হয়েছিল, তা আমি পড়েছি। কুরআনে 'কওম' শব্দটা কেবলমাত্র মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্যই প্রযোজ্য নয় ; অন্যান্য মানুষও এর শামিল। মিল্লাত (সম্প্রদায়), কওম (জাতি) এবং উম্মত (উপদল)-এসব শব্দের ব্যুৎপত্তি নিয়ে বির্তক করে কোনো ফল লাভ হবে না। ধর্মের দিক থেকে দেখলে ভারত বহু মানুষ যথা হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, পারসি, শিখদের মাতৃভূমি। হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের পার্থক্য বিরাট। তবে এই পার্থক্য ভারতের স্বাধীনতা লাভের পথে অন্তরায় হবে, এটা মেনে নেওয়া যায় না। আবার এটাও মানা যায় না—দুটো ভিন্ন ভিন্ন ধর্মবিশ্বাস ভারতকে অখণ্ড রাখার অন্তরায়। আসল বিষয় হচ্ছে আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা এবং কেমন করে আমরা তা লাভ করতে পারি। স্বাধীনতা হচ্ছে আশীর্বাদ এবং প্রত্যেকের এটা পাওয়ার অধিকার আছে। ধর্মের ভিত্তিতে এটা লাভ করা যায় না। মুসলমানদের মনে রাখা উচিত যে তারাই হচ্ছে বিশ্বব্যাপী জনগণের জন্য ইসলামিক বার্তা বহনকারী। ওরা কোনো ক্ষুদ্র জাতি বা গোষ্ঠী নয় যে, তাদের এলাকায় অন্য কেউ ঢুকতে পারবে না। সঠিকভাবে বলতে গেলে বলতে হবে ভারতের মুসলমানরা সবাই একই সম্প্রদায়ের নয়। বিভিন্ন গোষ্ঠীতে তারা বিভক্ত। হিন্দুদের বিরুদ্ধে উত্তেজনা ছড়িয়ে তাদের ঐক্যবদ্ধ করা যাবে ; কিন্তু ইসলামের নামে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করা যাবে না। তাদের কাছে ইসলাম অর্থ নিজেদের গোষ্ঠীর প্রতি নির্ভেজাল আনুগত্য। ওহাবি, সুন্নি, শিয়া ছাড়াও আরো অনেক গোষ্ঠী আছে, যাদের অনেক সাধু বা পীরের প্রতি আনুগত্য রয়েছে। ছোট ছোট বিষয় যেমন নামাযের সময় হাত তোলা বা সজোরে 'আমিন' শব্দ উচ্চারণ করা

নিয়েও বহু বাদানুবাদ হয়েছে। কিন্তু সমাধানে পৌছানো যায়নি। উলামারা যখন তখন 'তকফির' (কাউকে নাস্তিক ঘোষণা করা) ব্যবহার করছে। আগে ওরা ইসলাম ধর্মকে অবিশ্বাসীদের কাছে পৌছে দিত আর এখন ওরা বিশ্বাসীদের কাছ থেকেও ইসলামকে সরিয়ে দিয়েছে। ইসলামের ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে—কত সৎ ও ধার্মিক মুসলমানকে 'কাফের' বলে ফতোয়া দেওয়া হয়েছে। একমাত্র নবীরাই পারতেন এমন যন্ত্রণাদায়ক অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে।

তাদেরও এ ব্যাপারে বহু যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল ও বিচারের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। যখন যুক্তি ও বুদ্ধি বিদায় নিয়ে চলে যায় ও মানুষের মনোভাব প্রস্তরীভূত হয়ে যায়, তখন ধর্ম সংস্কারকের কাজ অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু বর্তমান অবস্থা তার চেয়েও বহুগুণে খারাপ। মুসলমানরা এখন তাদের সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে এক কঠিন অবস্থান নিয়েছে। ধর্মের চেয়ে রাজনীতিই ওদের কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য এবং পার্থিব জিনিসের মধ্যেই ওরা ধর্মের মূল খুঁজে পায়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে, যারা আমাদের ভালো করতে এসেছিল তাদের আমরা বিদ্রূপ করেছি ও বহু মানুষকে ত্যাগ ও স্বার্থহীন কর্মকে অবজ্ঞার চোখে দেখেছি। আমরা কে ? আমরা সাধারণ মরণশীল জীব। এমনকি বড় বড় প্রেরিত পুরুষ বা নবীকেও এসব পুরনো রীতিনীতি আঁকড়ে ধরা রক্ষণশীল মানুষদের শিকার হতে হয়েছিল।

প্রশ্ন : আপনি আপনার 'আল-হিলাল' পত্রিকার প্রকাশনা বহুদিন আগেই বন্ধ করে দিয়েছেন। এটা কি আপনার মুসলমানদের বুদ্ধিমত্তার প্রতি হতাশা কিংবা মনে করেছেন নির্জন মরুভূমিতে আযান দিয়ে কোনো ফল লাভ হবে না ?

উত্তর : আমি 'আল হিলাল' পত্রিকা বন্ধ করে দিয়েছি, তার অর্থ এই নয় যে, এর সত্যতা ও সততার ওপর বিশ্বাস হারিয়েছি। এই পত্রিকা বহু মুসলমানের মনে এক বিরাট আলোড়ন এনেছিল। ওরা ইসলাম, মানুষের স্বাধীনতা ও ন্যায়পরায়ণতার লক্ষ্যকে নিজেদের মনে দৃঢ় করেছে। এই অভিজ্ঞতায় আমিও প্রচুর লাভবান হয়েছি। মনে হয়েছিল হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সঙ্গে যাঁরা থাকতেন সেই সাহাবিদের মতো আমিও অনেক কিছু শিখলাম। আমি নিজে মোহাবিষ্ট হয়ে সেই পৌরাণিক 'ফিনিক্স' পাখির মতো পুড়ে গিয়ে আবার নবজীবনে ফিরে এলাম। 'আল হিলাল' তার উদ্দেশ্য সাধন করেছে ও নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। আমার অভিজ্ঞতার আলোকে নিজেকে পুনঃমূল্যায়ন করে দেশের স্বাধীনতা

লাভের জন্য সময় ও মন উৎসর্গ করে দিয়েছি। **আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে, এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের স্বাধীনতা ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির ওপর নির্ভরশীল এবং হিন্দু-মুসলমান ঐক্য ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির চাবিকাঠি,** এমনকি প্রথম মহাযুদ্ধের আগেও আমি স্থির নিশ্চিত ছিলাম, ভারত অবশ্যই স্বাধীন হবে এবং পৃথিবীর কোনো শক্তিই এটা রোধ করতে পারবে না। মুসলমানদের তখন কী ভূমিকা থাকবে, সে ব্যাপারেও আমি পরিষ্কার চিন্তা করেছিলাম। আমি আশা করেছিলাম, মুসলমানরা যেন অন্যান্য দেশবাসীর সঙ্গে একত্রে হাঁটে এবং ইতিহাস যেন কখনো বলতে না পারে—ভারতীয়রা যখন স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছিল তখন মুসলমানরা নীরব দর্শকের ভূমিকায় অভিনয় করেছিল; কখনো যেন না বলতে পারে—ভারতবাসী যখন প্রবল ঢেউয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল এবং স্বাধীনতার সৈনিকদের নৌকা ডুবে যাচ্ছিল, তখন মুসলমানরা আনন্দে হাততালি দিচ্ছিল।

ইফা—২০১০-২০১১-প্র/১০২১৩(উ)-৩,২৫০